



বীর শহীদ

মো: জাহিদুল হাসান

জন্ম তারিখ:

১ জুন, ২০০৮

শাহাদাতের তারিখ:

৫ আগস্ট, ২০২৪

বিভাগ:

ময়মনসিংহ

জেলা:

জামালপুর

শহীদের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

পেশা : ইলেকট্রিশিয়ান

শাহাদাতের স্থান : রাজলক্ষী কমপ্লেক্সের মোড়, উত্তরা, ঢাকা

শাহাদাতের বিস্তারিত ঘটনা ও ইতিহাস

বিদ্যুৎ ছোঁয়া শরীরে বিপ্লব ছুঁয়ে দিল -শহীদ মো: জাহিদুল হাসান

শহীদ পরিচিতি

জন্ম তার ২০০৮ সালের ১ জুন জামালপুর জেলার চাঁদপুর গ্রামে, এক মেঘলা দুপুরে, যখন মাঠে ধান পাকার সুবাস আর ঘরে নতুন অতিথির কান্না একসাথে বাতাসে মিশেছিল। নাম রাখা হয় জাহিদুল হাসান। বয়স তখন সতেরোতে এসে থেমে গেছে যেখানে শুরু হওয়ার কথা ছিল এক জীবনের, সেখানে শেষ হয়ে গেছে এক ইতিহাসের অধ্যায়। পিতা জিয়াউল হক, মাঠঘাটের চেনা মুখ, একজন কৃষক; মা জাহানারা বেগম, দুই বেলা রান্না করেন, মেয়ের জামা সেলাই করেন, ছেলের চোখে ভবিষ্যৎ খোঁজেন। পরিবারে দুই ভাইবোন জাহিদ বড়, বোন জাহ্নাভুল ফেরদৌস শেফা, সদ্য এইচএসসি পাস করে। একজন শহীদ বড় ভাই রেখে গেলে বোনের ডিগ্রির পাশে চিরস্থায়ী এক শোক জমে থাকে।

জীবনের সবচেয়ে কোমল বয়সে মাত্র ১৪ বছরের এক কিশোরী, ফারজানা আক্তারকে বিয়ে করেন জাহিদ। না, প্রেমের গল্প ছিল না, ছিল দরিদ্র সংসারের উপরে টিকে থাকার একটা প্রচেষ্টা। বাল্যবিরের দায় নয়, বরং এ ছিল দু'টি কিশোরী হৃদয়ের একটা আশ্রয় খোঁজার লড়াই। ফারজানা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছেন, চোখে ছিল স্বপ্ন একটা নিজস্ব ঘর, চারপাশে শান্তি আর বারান্দায় ছেলেমেয়ের দৌড়ঝাঁপ। কিন্তু দারিদ্র্য ততদিনে ফেড়ে ফেলেছে বইয়ের পাতা, চুরি করে নিয়েছে খেলার মাঠ, আর খোলা আকাশের নিচে রেখে দিয়েছে তাঁদের স্বপ্ন। জাহিদ স্কুল ছাড়েন, বই ফেলে হাতে তুলে নেন টেস্টার, স্ক্রু ড্রাইভার, বৈদ্যুতিক তার। ঢাকায় এসে ইলেকট্রিশিয়ানের কাজ নেন, চাকরি নয়, একপ্রকার যুদ্ধ, যেখানে প্রতিদিন বিদ্যুতের তার বেয়ে উঠে আসে জীবনধারণের আকৃতি। তাঁর পায়ের ছাপ থাকে কাঁচা সিমেণ্টে, রঙিন তারের মধ্যে লুকিয়ে থাকে নিঃশব্দ এক প্রতিজ্ঞা এই দেশের প্রতিটি ঘরে আলো জ্বলবে, তবে শুধু বৈদ্যুতিক নয়, ন্যায়ের আলো, বেঁচে থাকার আলো। যে আলো তাঁর নিজের ঘরে ছিল না, তা তিনি অন্যের ঘরে দিতে চেয়েছিলেন।

তিনি ছিলেন না কোনো রাজনীতিক দলের ব্যানারে, পোস্টারে তার ছবি ছিল না, কোনো মিছিলে শ্লোগানের মুখ নন। তিনি ছিলেন নিরীহ, গরিব, চুপচাপ। কিন্তু এই চুপচাপ তরুণটির হৃদয়ে ছিল এক আগ্নেয়গিরি। অন্যরা যখন ঘরে বসে ফোন স্ক্রল করত, জাহিদ তখন রাস্তায় নামতেন মোবাইল হাতে অন্যায়ের ভিডিও করতেন, সেগুলো অনলাইনে ছড়িয়ে দিতেন। মুখে কখনো কিছু বলতেন না, কিন্তু চোখে এক অব্যক্ত প্রতিজ্ঞা এই দেশ একদিন বদলাবে।

জুলাই বিপ্লব যখন ঘূর্ণিঝড় হয়ে উঠছে, তখন জাহিদ তাতে ছিলেন নিঃশব্দ সৈনিক হয়ে। গুলির শব্দে তাঁর দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় কিন্তু তাঁর কণ্ঠ থেমে যায়নি। মৃত্যু তাঁকে থামায়, কিন্তু থামাতে পারে না তাঁর বিশ্বাসকে। ছোট একটি জীবনে এতটা সাহস, এতটা নির্লোভ দেশপ্রেম তা রাষ্ট্র হয়তো এড়িয়ে যায়, মিডিয়া ভুলে যায়, কিন্তু ইতিহাস তা ভুলে না। ইতিহাস জানে, এক ইলেকট্রিশিয়ানের হাতে নয়, হৃদয়ে ছিল আলো; আর সেই আলো দিয়েই সে রচনা করে গেছেন বিপ্লবের নীরব ছায়া। জাহিদ মারা যান, কিন্তু তাঁর নাম হয়ে ওঠে সেই প্রশ্নবোধক চিহ্ন যে প্রশ্ন করে, কেন একটা সমাজ একজন গরিব কিশোরকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না? কেন সত্যভাষীদের জায়গা হয় কেবল কবরস্থানে?

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট: রক্তে লেখা জুলাইয়ের আশ্বিন

২০২৪ সালের জুলাই মাস রোদ যেন পুড়তে শেখে সেদিন, বাতাসে শুধু ঘামের গন্ধ নয়, ছিল প্রতিরোধের ঘ্রাণ। শিক্ষা, চিকিৎসা, নিরাপত্তা সবকিছু থেকে বঞ্চিত একটি প্রজন্ম তখন চোখ তুলে তাকিয়েছিল রাষ্ট্রের দিকে। কিন্তু রাষ্ট্র তখন আকাশের মতো দেখা যায়, ছোঁয়া যায় না। এই অদৃশ্য নিপীড়নের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ জন্ম নেয়, তা আর ছাত্র আন্দোলন ছিল না তা হয়ে ওঠে এক নতুন মুক্তিযুদ্ধ, এক অসম যুদ্ধ, যেখানে অস্ত্র ছিল না, ছিল বুকের সাহস। এই আন্দোলনের মূল শক্তি ছিল তারা, যারা কোনোদিন গণমাধ্যমের হেডলাইন হয় না যেমন জাহিদুল হাসান। উত্তরা রাজলক্ষী মোড়, ৪ আগস্টের সকাল সেই ঘনঘোর সকালেই কাউকে কিছু না বলে বাসা থেকে বেরিয়ে পড়েন জাহিদ। মা জাহানারা বেগম আঁচলে টেনে ধরেছিলেন, বাবা জিয়াউল হক বলেছিলেন, ‘‘তুই গরিব মানুষ, বিপ্লব তোর কাজ না।’’ কিন্তু একটি বুকের ভেতর যে আগুন জ্বলে, তা কী আর ঠান্ডা হয় নিষেধের জলে?

উত্তরার রাজলক্ষী মোড় তখন ঢলেপড়া মানুষের সমুদ্র হাতে পোস্টার, গলায় স্লোগান, চোখে অভিমান। জাহিদ সেখানে ছিলেন একা না পোস্টারধারী, না বক্তা তবুও চোখে ছিল এমন এক প্রত্যয়, যা অনেক ব্যানারের চেয়ে ভারী। রাষ্ট্র বুকে গিয়েছিল এরা শুধু চিৎকার করে না, এরা চুপ থেকেও বিপ্লব ঘটায়। তাই শুরু হয় দমনযজ্ঞ সাঁজোয়া গাড়ি, কালো পোশাক, হেলমেটের নিচে লুকোনো ভাড়াটে দানবরা নামে পথে। একে একে স্লোগান থেমে যায়, মানুষ ছত্রভঙ্গ হয়, কিন্তু জাহিদ দাঁড়িয়ে থাকেন এক গরিব কিশোর, যাঁর কোনো দল নেই, কিন্তু আছে দেশের জন্য নিবেদিত জীবন। দুপুর ১২টা ২০ মিনিট একটি শব্দ হয়, তারপর আরেকটি। দুইটি গুলি এসে ছিন্ন করে দেয় তাঁর স্বপ্নের শরীর। প্রথম গুলি ডান উরুর পাশ ছুঁয়ে তাঁর অণ্ডকোষ বিদ্ধ করে, মুছে দেয় পিতৃত্বের সম্ভাবনা রাষ্ট্র শুধু তাঁর জীবনই নয়নি, কেড়ে নিয়েছে এক অসম্ভব ভবিষ্যৎ। দ্বিতীয় গুলি ঠোঁট ভেদ করে ঢুকে যায় দাঁতের ভেতর দিয়ে তাঁর ভাষা থেমে যায়, কিন্তু তাঁর চোখ তখনও বলে যাচ্ছিল, ‘‘আমি বাঁচবো না, কিন্তু তুমিও পার পাবে না।’’

মাটিতে লুটিয়ে পড়েন জাহিদ। রক্তে ভেসে যেতে থাকে তাঁর মুখ, তাঁর শরীর, তাঁর স্বপ্ন। বন্ধু সিয়াম আর এক অচেনা পথচারী মিলে তাঁকে তুলে নেন কাঁধে করে নিয়ে যান উত্তরা উইমেন্স মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। তিনি বাঁচেন না। একদিন মৃত্যুর সাথেও লড়েন, কিন্তু হার মানেন না, বরং অক্ষরে অক্ষরে হয়ে যান এক প্রতীক এক গরিব কিশোর, যিনি অন্যায়ের মুখে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন না। সেই “না” শব্দটাই হয়ে ওঠে জুলাইয়ের সবচেয়ে সাহসী উচ্চারণ। রাষ্ট্র তাঁকে চুপ করিয়ে দেয়, কিন্তু ইতিহাস জাহিদের গুলিবিদ্ধ ঠোঁটকে ইতিহাসের সবচেয়ে স্পষ্ট উচ্চারণ হিসেবে লিখে রাখে।

শেষ মুহূর্ত ও একটি পরিবারের ধ্বংস: মৃত্যুর ভিতরেও দাঁড়িয়ে থাকা এক সাহসী প্রাণের গল্প

জীবনের সঙ্গে লড়াই কখনও একা হয় না বিশেষ করে যখন তা

মৃত্যুর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে শেষ আলিঙ্গনের জন্য অপেক্ষা করে। জাহিদুল হাসানের শেষ মুহূর্তগুলো ছিল না কোনো সিনেমার মতো বীরত্বে মোড়া ছিল কেবল রক্ত, ঘাম, শূন্যতা আর একধরনের অসীম বিশ্বাস, যে তিনি কিছু ভুল করেননি। যখন তাঁকে উত্তরা উইমেন্স মেডিকেল কলেজে আনা হয়, তখন তাঁর দেহে রক্ত নেই, ঠোঁট ফেটে চুপসে গেছে, মুখে আর ভাষা নেই, কিন্তু চোখ তখনও ছিল খোলা যেন বলতে চাইছে, “আমি তো ঠিক কাজটাই করেছিলাম, তাই না?”

ডাক্তাররা লড়লেন, রক্ত খোঁজা হলো, লাইফ সাপোর্টে রাখা হলো এক নবীন বিপ্লবীর দেহ কিন্তু রাষ্ট্র যখন শরীরে গুলি চালায়, তখন চিকিৎসাও থেমে যায় তাদের ভয় আর অনুমতির পেছনে। ৫ আগস্ট, দুপুর ২টা ২০ মিনিট একটি তরুণ প্রাণ থেমে যায়, যার হৃদয় ছিল আর দশটা ছেলে-মেয়ের মতো, কিন্তু সাহস ছিল হাজারের চেয়েও বেশি। এই মৃত্যুর খবর তখনও ভাইরাল হয়নি, পোস্ট হয়নি ফেসবুকের প্রোফাইলে, টুইটারে ট্রেন্ডিং হয়নি তাঁর নাম তবে এক মা বুঝেছিলেন, তাঁর বুক ফাঁকা হয়ে গেছে, এক বাবা বুঝেছিলেন, কাঁধটা চিরদিনের মতো ভারী হয়ে গেল।

শহর তখন কারফিউর দখলে, রাস্তায় টহল দিচ্ছে গর্জে ওঠা হেলমেটধারীরা। গুলির ভয়, পুলিশের দমন, কাঁদানে গ্যাসের দমক সবকিছু মিলে এক নিঃসঙ্গ ভয়াবহতা। কোনো অ্যাম্বুলেন্স নেই, কোনো লাশবাহী গাড়ি নেই জাহিদের দেহ পড়ে থাকে, ঠাণ্ডা হয়ে আসে, কিন্তু রাষ্ট্রের জন্য তা কেবল এক মৃত শরীর। রাত ১০টায় অনেক চেষ্টায় একটি গাড়ি মেলে। চাঁদপুর গ্রামে ফিরিয়ে নেওয়া হয় শহীদের নিখর দেহ মিরপুর থেকে জামালপুরের ভাঙা সড়কে কাঁপতে কাঁপতে, এক অসহনীয় যাত্রা। রাত ২টায় পৌঁছায় তাঁরা, ততক্ষণে গ্রামে কান্নার আওয়াজ বাতাসের সঙ্গে মিশে গেছে।

৬ আগস্ট, সকাল ১০টা একটি কবর খোঁড়া হয়। নয়, শুধু মাটি খোঁড়া হয়নি, খোঁড়া হয়েছে একটি পরিবারের ভবিষ্যৎ, একটি দেশের বিবেক। সেই কবরে ঘুমিয়ে যান জাহিদুল একজন বিদ্রোহী, যার হাতে অস্ত্র ছিল না, ছিল শুধু মোবাইল ফোন আর সাহস। তাঁর মা আজও সেই কবরের মাটি ছুঁয়ে থাকেন যেন ছেলের গায়ে হাত রাখছেন। বাবা কথা হারিয়ে ফেলেছেন ভেঙে পড়েছেন শারীরিক ও মানসিকভাবে। ছোট বোন জাম্মাতুল আর কথা বলে না কারো সঙ্গে। স্ত্রী ফারজানা, মাত্র ১৪ বছর বয়সেই বুঝে ফেলেছে ‘শহীদের বউ’ হওয়া মানে সারাজীবন মরা মানুষের স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখা, নিজের বেঁচে থাকাটাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা।

এখন এই পরিবারে নেই কোনো আয়, নেই কোনো ভরসা। রাষ্ট্র কেবল একজনকে মেরেই থামে না, রাষ্ট্র একেকটি পরিবার ধ্বংস করে, ধ্বংস করে তাদের স্বপ্ন, শান্তি, ভবিষ্যৎ। আর আমরা? আমরা হয়তো ভুলে যাব, পোস্টের নিচে নতুন ট্রেন্ডের কথা বলব। কিন্তু যে দেখেছে তাঁর রক্ত গড়িয়ে পড়তে, যে শুনেছে সেই গুলির শব্দ তার হৃদয়ে জাহিদ চিরকাল বেঁচে থাকবে। কারণ কেউ না বললেও, আমরা জানি তিনি মৃত্যুর ঠিক আগ মুহূর্ত পর্যন্তও মুখ ফিরিয়ে নেননি অন্যায়ের সামনে।

পারিবারিক অবস্থা

পরিবারের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। শহীদের পিতা বর্তমানে পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি এবং ছেলের মৃত্যুতে তিনি শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। শহীদের বোন জাম্মাতুল ফেরদৌস শেফা নিজের পড়াশোনার খরচ চালানো এবং পরিবারের সহায়তার জন্য একটি চাকরির আবেদন জানিয়েছেন।

প্রস্তাবনা

১) জাম্মাতুল ফেরদৌস শেফার জন্য স্থানীয়ভাবে একটি সম্মানজনক চাকরি, যাতে তিনি পরিবারের দায়িত্ব নিতে পারেন

২) শহীদের স্ত্রীর জন্য নিরাপত্তা ও আর্থিক সহায়তা প্রদান

এক নজরে শহীদ পরিচিতি

নাম : মো: জাহিদুল হাসান

জন্ম তারিখ ও স্থান : ০১ জুন, ২০০৮; গ্রাম: চাঁদপুর, ইউনিয়ন: দিগপাইত, উপজেলা: জামালপুর সদর, জেলা: জামালপুর

বয়স (শাহাদাতের সময়) : ১৬ বছর

পিতার নাম, বয়স ও পেশা : মো: জিয়াউল হক (বয়স ৪৫); পেশা: কৃষক/দিনমজুর

মাতার নাম, বয়স ও পেশা : মোছাঃ জাহানারা বেগম (বয়স ৪০); পেশা: গৃহিণী

ভাইবোন : এক ভাই (জাহিদুল নিজে) ও এক বোন

: বোন: জাম্মাতুল ফেরদৌস শেফা (বয়স ১৯); এইচএসসি পাশ (২০২৪)

স্ত্রী : ফারজানা আক্তার (বয়স ১৪); পেশা: গৃহিণী; অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন

স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: চাঁদপুর (মাতানপাড়া), ইউনিয়ন: দিগপাইত, উপজেলা: জামালপুর সদর, জেলা: জামালপুর

বর্তমান ঠিকানা (ঢাকায়) : ঢাকায় পরিবারের সাথে থাকতেন (২০১৯ সাল থেকে)

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও শৈশব : শৈশবে ১১১ নং চাঁদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সামান্য লেখাপড়া করেন (প্রাথমিক পর্যন্ত)। কৈশোরে ক্রিকেট, ফুটবল এবং ব্যাডমিন্টন খেলতে ভালোবাসতেন

পেশা ও কর্মজীবন : পরিবারের আর্থিক অনটনের কারণে ২০১৯ সালে মা-বাবার সাথে ঢাকায় আসার পর পড়ালেখা বাদ দিয়ে ইলেকট্রিশিয়ানের কাজে যোগ দেন।

আন্দোলনে অংশগ্রহণ ও প্রেরণা : জুলাই বিপ্লবে বৈষম্যহীন ছাত্র-জনতার উপর নির্যাতন তার মনকে ব্যথিত করে। ৩রা আগস্ট পর্যন্ত তিনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছাত্রদের পক্ষে

সক্রিয় ছিলেন। মা-বাবার নিষেধ সত্ত্বেও ৪ঠা আগস্ট ভোরে কাউকে না জানিয়ে বাসা থেকে বের হয়ে উত্তরায় ছাত্রদের সাথে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন

শাহাদাতের স্থান : রাজলক্ষী কমপ্লেক্সের মোড়, উত্তরা, ঢাকা

আহত হওয়ার তারিখ ও সময় : ০৪ আগস্ট, ২০২৪ (রবিবার), আনুমানিক দুপুর ১২:২০ থেকে ১২:৩০ মিনিট

মৃত্যুর তারিখ ও সময় : ০৫ আগস্ট, ২০২৪ (সোমবার), দুপুর ২:২০ মিনিট

আহত হওয়ার বিবরণ : শরীরে দুইটি গুলি লাগে। একটি গুলি ডান উরুর কোণায় (রানের চিপায়) লেগে অণুকোষ ভেদ করে বেরিয়ে যায়; অন্য একটি গুলি ঠোঁট বরাবর লেগে দাঁত ভেঙ্গে মুখের ভেতরে প্রবেশ করে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হয়।

আঘাতকারী : স্বৈরাচারী সরকারের লেলিয়ে দেওয়া পেট্রোবাহিনী ও পুলিশের আক্রমণে শহীদ হয়েছেন।

হাসপাতাল ও চিকিৎসা : আহত অবস্থায় তার সাথে থাকা ২ জন বন্ধু এবং একজন পথচারী তাকে উদ্ধার করে উত্তরা ১নং সেক্টরে অবস্থিত "মেডিকেল কলেজ ফর উইমেন্স এন্ড হসপিটাল"-এ (উত্তরা মহিলা মেডিকেল) নিয়ে যায়। সেখানে তাকে আইসিইউতে ভর্তি করে লাইফ সাপোর্টে রেখে চিকিৎসা দেওয়া হয়। চিকিৎসকদের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি এবং ০৫ আগস্ট দুপুর ২:২০ মিনিটে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর কারণ হিসেবে "অপরিবর্তনীয় কার্ডিওপ্যালমোনারি ফেইলিওর" উল্লেখ করা হয়েছে।

দাফন : ০৫ আগস্ট রাতে শহীদের মরদেহ গ্রামের বাড়ি জামালপুরে আনতে গাড়ির অভাবে বিলম্ব হয়; রাত ২টায় মরদেহ পৌঁছায়। ০৬ আগস্ট, ২০২৪ (মঙ্গলবার), সকাল ১০টায় গ্রামের পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

পরিবারে বর্তমানে ৪ জন সদস্য : পিতা, মাতা, স্ত্রী ও বোন

কলিজার রক্তে রাঙানো জুলাই-

হৃদয় ছিল না কোনো বক্তা, না-ই বা ব্যারিকেডে নেতৃত্ব দেওয়া নেতা।

তবু সে শহীদ, কারণ সে সত্যের পক্ষে নিহত, অন্যায়ের গুলিতে রক্তাক্ত।

একটি রাষ্ট্র যাকে বাঁচাতে পারেনি, সেই রাষ্ট্রের বিবেক যেন অন্তত লজ্জিত হয়।

পবিত্র কুরআনের বাণী

আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনোই মৃত মনে করো না; বরং তারা জীবিত এবং তাদের রবের কাছ থেকে তারা জীবিকা-প্রাপ্ত হয়ে থাকে। (সূরা আল-ইমরান ৩:১৬৯)

হাদীস শরীফ

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “শহীদদের জন্য জাহা্নতে ৭০ জন আত্মীয়ের জন্য সুপারিশ করার অধিকার থাকবে।” (সুনান আবু দাউদ ২৫২০)

দোয়া পাঠ: ০ জন